মধুসূদনের সাহিত্য ঃ সেকালের আলোচনা

সম্পাদনা ঃ বিষ্ণু বসু

পুনশ্চ

৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

বিষয়সূচী

কবি মাইকেল মধুসূদন	রাজনারায়ণ বসু ১৫
মধুসূদন সম্পর্কে প্রস্তাব	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৮
মধুসূদন	শিবনাথ শাস্ত্রী ২০
কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত	অক্ষয়কুমার সরকার ২২
মহাকবি মধুসূদন	সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ২৪
বঙ্গসাহিত্যে মাইকেল	কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ ২৯
মাইকেল মধুসূদন দত্ত	রজনীকান্ত গুপ্ত ৩৫
মাইকেলের কাব্য সমালোচনা	বিশ্বকোষ ৫৬
মাইকেল মধুসূদন দত্তের গ্রন্থাবলীর ভূমিকা	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৬১
শর্মিষ্ঠা	বিবিধার্থ সংগ্রহ ৬৭
শর্মিষ্ঠা নাটকাভিনয়	সোমপ্রকাশ ৭২
পদ্মাবতী	বিবিধার্থ সংগ্রহ ৭৪
একেই কি বলে সভ্যতা	বিবিধার্থ সংগ্রহ ৭৫
মাইকেল মধুসূদন দত্তের শর্মিষ্ঠা প্রভৃতি নাটক	রামগতি ন্যায়রত্ন ৭৭
মধুসূদনের নাট্য প্রতিভা	নলিনীকান্ত ভট্টশালী ৮৬
তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য	রাজেন্দ্রলাল মিত্র ৯৩
মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনা	রাজনারায়ণ বসু ৯৯
মেঘনাদবধ কাব্য সম্বন্ধে কয়টি কথা	শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ১০৭
মেঘনাদবধ কাব্য	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ১১৬
বঙ্গদেশীয় মহাকাব্য	সারদাচরণ মিত্র ১২৩
প্রমীলা ও ইন্দুবালা	নক্ষত্রনাথ দেব ১২৬
সীতা ও সরমা	দীননাথ সান্যাল ১৩৭
মেঘনাদবধ ও ব্রজাঙ্গনা কাব্য	বিবিধার্থ সংগ্রহ ১৫১
ব্রজাঙ্গনা	পূর্ণচন্দ্র বসু ১৫৩
বীরাঙ্গনা	বীরেশ্বর গোস্বামী ১৫৭
চতুর্দশপদী কবিতায় মহাকবি মধুসূদন	শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৭৪
মৃত মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও মায়াকানন	কৈলাসচন্দ্র বসু ১৮৮
সাহিত্য-সেবকের ডায়েরি	নিত্যকৃষ্ণ বসু ১৯৯

প্রাক্-কথন

১

মধুসূদন প্রয়াত হলে 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় একটি সাবধানি শোকবার্তায় লেখা হয়েছিল, 'আমরা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম, মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৬ই আষাঢ় দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইনি একজন সুকবি ছিলেন। ইঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা দেশ ক্ষতিগ্রস্থ হইলেন। তিনি জীবিত থাকিলে আমরা মেঘনাদবধ কাব্যের অনেক সহোদর দেখিতে পাইতাম। তিনি একটি নূতন ছন্দের সৃষ্টিকর্তা। ছন্দটি সুললিত ও সুহৃদয় জনের হৃদয়গ্রাহী হয় নাই বটে; কিন্তু বাগ্‌দেবী তাঁহাকে কবির শক্তি দ্বারা অলংকৃত করিয়াছিলেন। উহা নব্যদলে একপ্রকার লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে। ছন্দ যেরূপ হউক্ তিনি যে অসামান্য কবিত্ব শক্তিসম্পন্ন ছিলেন সে বিষয়ে সংশয় নাই।' [বিনয় ঘোষ সম্পাদিত 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, চতুর্থ খণ্ড' পৃ. ৭১৩।]

উদ্ধৃত শোকবার্তাটি বিশ্লেষণ করলে একটি আশ্চর্য বৈপরীত্য লক্ষ করা যায়। এ লেখায় মধুসূদনের অসামান্য কবিত্ব শক্তির অকুণ্ঠ প্রশংস্যবাণী প্রকাশ পেয়েছে, অথচ যে ছন্দ নির্মিতির জন্য তিনি আজও অবিস্মরণীয় তাঁর সে কৃতিত্বকে প্রতিবেদক যেন অস্বীকার করতে চান। কবিত্ব শক্তি রয়েছে অথচ তার প্রকাশের আয়ুধটি দুর্বল এ ধরনের সিদ্ধান্ত আর যাই হোক কোনও মহৎ কবির পক্ষে গৌরবের কথা হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ যখন লেখেন 'প্রকাশই কবিত্ব', তার গূঢ় বার্তাটি সহৃদয় সামাজিক অবশ্যই উপলব্ধি করতে পারেন। বাক্ ও অর্থের সম্পৃক্ততা চিরকাল স্বীকৃত হয়ে আসছে। শব্দ ও অর্থের পরস্পর প্রতিস্পর্দ্ধিতার কথা প্রাচীন ভারতীয় কাব্যতাত্ত্বিক অত্যন্ত জোরের সঙ্গেই ঘোষণা করেছিলেন। তাহলে মধুসূদনের ক্ষেত্রে তার অন্যথা ঘটল কেন? এখানেই রয়ে গেছে মধুসূদনকৃত সাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রে সমকালীন আলোচকদের দ্বিধা ও বৈপরীত্য।

আসলে মধুসূদন যখন বাংলা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করলেন, তাঁর যেন আগমন হল না, ঘটল আবির্ভাব। তখন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় জনপ্রিয়তা পেলেও বাঙালির রুচি ও চেতনা আচ্ছন্ন করে ছিলেন ভারতচন্দ্র। একদিকে সংস্কৃত সাহিত্যের স্মৃতি, অন্যদিকে ভারতচন্দ্রের আধিপত্য এতটাই জমাট ছিল যে স্বয়ং ঈশ্বর গুপ্ত ও রঙ্গলালও তাতে তেমন ফাটল ধরাতে পারেননি। তাই পয়ারের মৃদু প্রবাহ

আমাদের সাহিত্যের অনিবার্য ভবিতব্য বলে স্বীকৃত হয়ে আসছিল। রঙ্গলাল নতুন যুগের উপযোগী করে বাংলা কবিতা বিষয়ক প্রস্তাব লিখে চিন্তায় কিছু পরিবর্তনের আভাস আনলেও শেষপর্যন্ত এমনকী শিক্ষিত সুধীজনও প্রচলিত অভ্যাসেরই অনুবর্তন করে চলেছিলেন। বিশ্বনাথ কবিরাজ ও তাঁর 'সাহিত্যদর্পণ' তখন সাহিত্য বিষয়ের শেষকথা বলে গৃহীত ছিল।

মধুসূদনের আবির্ভাব ঘটল এ গতিহীনতাকে আক্রমণ করে। ঈশ্বর গুপ্ত মধুসূদনের থেকে মাত্র বারো বছরের বড় ছিলেন, রঙ্গলাল তো বয়সে ছোটই ছিলেন অথচ তাঁরা কবি হিসেবে স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন অনেক আগে। ইংরেজি কবিতা লিখে অবশ্য মধুসূদন হাত পাকিয়েছিলেন দীর্ঘকাল ধরে, কিন্তু বাংলায় লিখতে শুরু করলেন বেশ পরিণত বয়সে। ততদিনে তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকে স্বীকরণ করে নিয়েছেন। ধ্রুপদী গ্রিক লাতিন হিব্রু সংস্কৃত তাঁর আয়ত্ত। ইংরেজি জানেন সাধারণ ইংরেজদের চাইতেও অনেক ভালো। ব্যাস বাল্মীকি হোমার ভার্জিল ওভিদ তার রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে। তাই বিশ্বসাহিত্য মন্থন করে মধুসূদন যখন প্রবল সমারোহে আবির্ভূত হলেন, বাঙালি পাঠক বিস্মিত ও আনন্দিত হলেন। সম্ভবত কিছুটা হকচকিয়েও গেলেন, এ দ্বিধার পরিচয় রয়ে গেল মধুসূদনকে নিয়ে আলোচনার আদিপবে বিভিন্ন বিদ্বজ্জনের রচনায়। তাঁরা প্রায় সকলেই মধুসূদনের কবিত্বশক্তিকে অস্বীকার করতে পারলেন না। তবে গ্রহণে বর্জনে তাঁর আসল পরিচয় কি দাঁড়াল সে বিষয়ে কদাচিৎ কোনও প্রত্যয়ে পৌঁছোতে সক্ষম হলেন না। 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার শোকবার্তায় প্রকাশ পেয়েছে এমন মনোভাবেরই নির্যাস।

মধুসূদন সম্পর্কে আলোচনার গোড়ার যুগে যেসব অভিমত উঠে এসেছে তাদের মধ্যে কয়েকটি বৈশিষ্ট লক্ষ করার মতো। বেশ কিছু আলোচকের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল 'সোমপ্রকাশ'-এর সমধ্বনি। মধুসূদন কবি হিসেবে শক্তিমান, কিন্তু তাঁর ছন্দ ও অলংকার প্রয়োগ তেমন গৌরবজনক হতে পারে নি। অথচ কবিত্বের অন্যতম শর্তই হল Nothing depends upon the subject, all upon the treatment of the subject. (saintsbury) ।

অনেকেই আবার হিন্দু মধুসূদন ও খ্রিস্টান মধুসূদনের মধ্যে দ্বান্দ্বিকতার রহস্য উন্মোচনে নিজেদের গভীরভাবে নিয়োগ করেছেন। এমনকী মধুসূদনের নিকটতম বন্ধু রাজনারায়ণ বসু, যাঁর সাহিত্য রসবোধের উপর ছিল তাঁর অগাধ আস্থা, 'মেঘনাদবধ কব্যে' আলোচনা প্রসঙ্গে হিন্দুত্ব ভারতীয়ত্ব প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি প্রায়শই মনোনিবেশ করেছেন। অবশ্য শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মধ্যে কোনও জাতির অন্তর্নিহিত সত্তা ও ধর্মের নির্যাস প্রতিফলিত হতে বাধ্য কিন্তু তা অবশ্যই তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা নিয়ে নয়। জাতি ও ধর্ম বলতে সাধারণত প্রচলিত নীতি ও অভ্যাসকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। তার ফলে

প্রশ্রয় পায় সংস্কার এবং আহত হয় মানবিকতা। অথচ সাহিত্য শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা পায় প্রচলিত নীতি ও অভ্যাসকে আক্রমণ করেই, তার প্রতিষ্ঠা মানবিকতার উদ্বোধনে। অবশ্য এ প্রকাশ ঘটাতে হবে শিল্পসঙ্গতভাবে। তবে রাজনারায়ণের গুরুত্ব এখানেই যে তিনি এ ধরনের ধারণার মধ্যে সর্বদা নিজেকে সীমিত রাখেন নি, তাই তিনি মধুসূদনের রচনার আস্বাদনে সংকীর্ণতাকে সর্বদা আঁকড়ে থাকেন নি। আমাদের সংকলিত বহু প্রবন্ধের মধ্যেই কিন্তু লেখকদের এ বিষয়ে দ্বিধা গোপন থাকে নি।

২

রবীন্দ্রনাথ নিতান্ত তরুণ বয়সে মেঘনাদবধ কাব্য নিয়ে একটি উচ্চাভিলাষী ও আক্রমণাত্মক আলোচনা করেছিলেন। তিনি মেঘনাদবধকে মহাকাব্য বলে স্বীকার করতেই রাজি ছিলেন না। তাঁর অভিমত ছিল ঃ

১। আমরা দেখিতেছি, হোমারের সময়ে শারীরিক বলকেই বীরত্ব বলিত, শারীরিক বলের নামই ছিল মহত্ত্ব। বাহুবলদৃপ্ত একিলিসই ইলিয়াডের নায়ক ও যুদ্ধবর্ণনাই তাহার আদ্যোপান্ত। আর আমরা দেখিতেছি, বাল্মীকির সময়ে ধর্মবলই যথার্থ মহত্ত্ব বলিয়া গণ্য ছিল— কেবলমাত্র দাম্ভিক বাহুবলকে তখন ঘৃণা করিত। হোমারে দেখ, একিলিসের ঔদ্ধত্য, একিলিসের বাহুবল, একিলিসের হিংস্র প্রবৃত্তি; আর রামায়ণে দেখ, একদিকে রামের সত্যের অনুরোধে আত্মত্যাগ, একদিকে লক্ষ্মণের প্রেমের অনুরোধে আত্মত্যাগ, একদিকে বিভীষণের ন্যায়ের অনুরোধে সংসারত্যাগ। রামও যুদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু সেই যুদ্ধ ঘটনাই তাঁহার সমস্ত চরিত্র ব্যাপ্ত করিয়া থাকে নাই, তাহা তাঁহার চরিত্রের সামান্য এক অংশ মাত্র। ইহা হইতেই প্রমাণ হইতেছে, হোমারের সময়ে বলকেই ধর্ম বলিয়া জানিত ও বাল্মীকির সময়ে ধর্মকেই বল বলিয়া জানিত। অতএব দেখা যাইতেছে, কবিরা স্ব স্ব সময়ের উচ্চতম আদর্শের কল্পনায় উত্তেজিত হইয়াই মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন ও সেই উপলক্ষে ঘটনাক্রমে যুদ্ধের বর্ণনা অবতারিত হইয়াছে—যুদ্ধের বর্ণনা করিবার জন্যই মহাকাব্য লেখেন নাই।

২। মেঘনাদবধের অনেক স্থলেই হয়তো কবিত্ব আছে, কিন্তু কবিত্বগুলির মেরুদণ্ড কোথায়! কোন্ অটল অচলকে আশ্রয় করিয়া সেই কবিত্বগুলি দাঁড়াইয়া আছে! যে একটি মহান্ চরিত্র মহাকাব্যের বিস্তীর্ণ রাজ্যের মধ্যস্থলে পর্বতের ন্যায় উচ্চ হইয়া ওঠে, যাহার শুভ্র তুষার ললাটে সূর্যের কিরণ প্রতিফলিত হইতে থাকে, যাহার কোথাও বা কবিত্বের শ্যামল কানন, কোথাও বা অনুর্বর বন্ধুর পাষাণস্তূপ, যাহার অন্তর গূঢ় আগ্নেয় আন্দোলনে সমস্ত মহাকাব্যে ভূমিকম্প উপস্থিত হয়, সেই অভ্রভেদী বিরাট মূর্তি মেঘনাদবধ কাব্যে কোথায়?

৩। হীন ক্ষুদ্র তস্করের ন্যায় নিরস্ত্র ইন্দ্রজিৎকে বধ করা, অথবা পুত্রশোকে অধীর

হইয়া লক্ষ্মণের প্রতি শক্তিশেল নিক্ষেপ করাই কি একটি মহাকাব্যের বর্ণনীয় হইতে পারে? ...মেঘনাদবধ কাব্যের পাত্রগণের চরিত্রে অনন্যসাধারণতা নাই, অমরতা নাই। মেঘনাদবধের রাবণে অমরতা নাই, রামে অমরতা নাই, লক্ষ্মণে অমরতা নাই, এমনকী ইন্দ্রজিতেও অমরতা নাই।

'মেঘনাদবধ কাব্য' নামের রবীন্দ্রনাথের এ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় 'ভারতী' পত্রিকার ১২৮৯ সালের ভাদ্র সংখ্যায়। পরে তা 'রবীন্দ্র রচনাবলী' অচলিত সংগ্রহের দ্বিতীয় খণ্ডে। তখন তাঁর বয়স মাত্র একুশ। উত্তরকালে অবশ্য রবীন্দ্রনাথ মেঘনাদবধ কাব্যের প্রতি ক্ষমাহীন মনোভাবের জন্য অনুতাপ প্রকাশ করেছিলেন এবং এ লেখাকে রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত করতে আপত্তিও জানিয়েছিলেন। কিন্তু উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যটির প্রতি তাঁর খন্ডিত দৃষ্টির মূলে সম্ভবত একটি অনিবার্য সত্যও নিহিত ছিল। আসলে উনিশ শতকের বাংলা যতটুকু মহাকাব্যিক ব্যাপ্তি অর্জন করেছিল 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রকাশ করেছিল তারই মহত্ত্ব, যুগের দ্বিধা ও দুর্বলতাসহ। তখন সারা পৃথিবীতে এসে গেছে গীতিকাব্যের পরিবেশ ও তার রোমান্টিক উল্লাস। মধুসূদন ছুটতে চেয়েছিলেন সময়ের উল্টো স্রোতে, অসামান্য কবিত্ব নিয়ে তাতে সক্ষমও হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যখন আবির্ভূত হলেন তিনি হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রকে অস্বীকার করলেন এবং মধুসূদনকেও অন্তর থেকে গ্রহণ করতে চাইলেন না। মধুসূদনের প্রতি তারুণ্যের প্রগলভতার জন্য প্রগাঢ় যৌবনে কুণ্ঠিত হলেন বটে, ইতস্তত অনুরাগী মন্তব্যও অভিব্যক্ত হল, কিন্তু তাঁকে নিয়ে কখনো উচ্ছ্বসিত হলেন না যেমন হয়েছিলেন বিহারীলালকে নিয়ে। গীতিকাব্যের অনুভব নিয়ে সমীপবর্তী হলেন মহাকাব্যের, তাই মধুসূদন তো বটেই, হোমারের প্রতিও নিষ্করুণ হলেন, বাল্মীকিও সম্ভবত যথাযোগ্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত হলেন না তাঁর লেখায়। তবু রবীন্দ্রনাথের এ লেখাতেও সময়ের পদচিহ্ন রয়ে গেল অত্যন্ত নির্ভুলভাবে। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে 'মেঘনাদবধ কাব্য' নিবন্ধ বাঙালি পাঠকের কাছে তেমন গৃহীত না হলেও উত্তরকালের অগ্রগণ্য আলোচক বুদ্ধদেব বসুর অনুকূলতা কিন্তু প্রকাশ পেয়েছে অনেকটাই রবীন্দ্রনাথের পক্ষে।

৩

মধুসূদনের প্রতি অনুরাগে বিরাগে বাঙালি মননের এ দ্বান্দ্বিকতা দীর্ঘকাল ধরে বিবিধ আলোচনায় সেকালে প্রকাশ পেয়েছিল। ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে জুন মধুসূদনের স্মৃতিসভায় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন.... 'সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাসের কাব্যাবলীর প্রত্যেকখানিই যেমন নিজের নিজের এক অতি অসাধারণ ধর্মে শ্রেষ্ঠত্ব সম্পন্ন, মধুসূদনের কাব্যগ্রন্থগুলিরও প্রত্যেকখানি সেইরূপ এক অতি অসাধারণ ধর্মে বিমণ্ডিত ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পন্ন' [মানসী ও মর্মবাণী ১৩২৩-২৪]।

তিনি আরও বলেছিলেন, 'পশ্চিম গগনের সুচারু সান্ধ্যরাগের আভায় তিনি তদীয় কবিতা রাণীর ললাট মার্জনা করিয়া দিয়াছেন মাত্র, কিন্তু তাহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন প্রাচীর অরুণরাগে।'

একই বছরে 'মানসী ও মর্মবাণী' পত্রিকায় দীননাথ সান্ন্যাল মেঘনাদবধ কাব্যে 'অলঙ্কার' প্রবন্ধে লিখলেন, অনেক স্থলেই তিনি (মধুসূদন) সংস্কৃতের আদর্শে অলঙ্কারগুলির পারিপাট্য সাধনে অন্যান্য বাঙলা কবিদিগের অপেক্ষা সমধিক মনোযোগী। তাঁহার ব্যবহৃত অলঙ্কারগুলি সকল স্থলেই অলঙ্কার শাস্ত্রানুসারে নির্দোষ না হইলেও অধিকাংশ স্থলে সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী। একেবারে দোষবর্জিত কাব্য সংস্কৃতেও বিরল। বাঙলা কাব্যের তো কথাই নাই।'

'মেঘনাদবধ কাব্যে রস' নামের একটি নিবন্ধে দীননাথ সান্ন্যাল আরও লিখেছিলেন; সুভ্রাতৃবৎসল রামের মুখ দিয়া কবি যে চমৎকার ভ্রাতৃবাৎসল্যের অভিব্যক্তি করিয়াছেন, বাঙলা কাব্য-সাহিত্যক্ষেত্রে তাহা রসের সংযত সমাবেশে মেঘনাদবধ কাব্য খানি কাব্যাংশে বড়ই উপভোগ্য। ইহাতে ছন্দের স্বাধীনতা, ভাষার রসোপযোগিতা ও বিবিধ অলঙ্কারের পারিপাট্য সর্বত্রই রসের উৎকর্ষ ও পরিপুষ্টি সাধন তো করিয়াছেনই, তাহা ছাড়া সংযত তুলিকা পাতে সর্বত্রই রস চমৎকার গাঢ় হইয়াছে। ...মধুসূদনের রসসৃষ্টিতে সর্বত্রই এইরূপ সংযম লক্ষিত হয়। ইহা অসাধারণ ক্ষমতার পরিচায়ক।' (মানসী ও মর্মবানী, ১৩২৩)। আবার এ সমালোচকই 'মেঘনাদবধ কাব্যের দোষ বিচার' নিবন্ধে কবির, ছন্দের দোষ, গ্রাম্যতা, অধিক্ষরতা, শ্রুতিকটুতা, অবাচকতা, অশালীনতা (৮ম সর্গে প্রেতলোকের কামুক কামুকীর দৃশ্যে, অনুচিততা, রসদোষ), অর্থদোষ, পাত্রানৌচিত্য' প্রভৃতি নানা ধরণের দোষের তালিকা দিয়ে শেষে মন্তব্য করেছিলেন, 'বাল্মীকি ব্যাস মিল্টন হোমার ভার্জিলে—সকলের কাব্যেই দোষ লক্ষিত হয়। মধুসূদনও নিয়মের বহির্ভূত নহেন। কিন্তু গুণাংশে বাংলায় আর একখানি কাব্য নাই, যাহা ইহার সমকক্ষ হইতে পারে' (মানসী ও মর্মবানী, ১৩২৪।)

'মধুসূদন ও ফরাসী সাহিত্য' প্রবন্ধে দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মধুসূদনের কিছু কবিতা ও নাটকে লা ফতেন ও ম্যালিয়েরের প্রভাব স্বীকার করেও তাঁর কৃতিত্ব বিশ্লেষণ করেছিলেন। এমনকী 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' যে ম্যলিয়েরের তার্ত্যুফকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে, এমন মন্তব্যও করেছেন (প্রবাসী, ১৩৫৫ অগ্রহায়ণ)।

উনিশ শতকে তো বটেই, বিশ শতকের গোড়ার দিকেও দীর্ঘকাল জুড়ে মধুসূদন—আলোচনার মধ্যেও প্রকাশ পেয়েছে কবির জীবন ও কাব্যে নিয়ে ব্যাপক কৌতূহল। প্রচলিত ধর্ম ও নীতিবোধ এবং সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বের প্রতাপে কখনো কখনো বিচারের ক্ষেত্রে হয়তো দেখা দিয়েছে সঙ্কীর্ণতা ও একমুখীনতা, তবু তার মধ্য দিয়েও এ ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্বকে বুঝে নেবার চেষ্টা চলেছে নিরন্তর। উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথের সর্বগ্রাসী